১১ স্বদেশি আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা ও ব্যর্থতার কারণ

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশি আন্দোলন অচিরেই বাংলার জনমানসে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। স্বদেশি আন্দোলন তার বহুমুখী কর্মসূচি ও কার্যকলাপের সাহায্যে এই প্রথম সমাজের একটি বড় অংশকে আধুনিক জাতীয়তাবাদী রাজনীতির আঙিনায় এবং আরও বড়ো অংশকে রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার চৌহদ্দিতে টেনে আনতে পেরেছিল। জাতীয় আন্দোলনের সামাজিক ভিত্তি সম্প্রসারিত হয়েছিল। জমিদার শ্রেণীর একাংশ, শহরাঞ্চলের নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং স্কুল ও কলেজের ছাত্ররা ব্যাপকভাবে এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। বাংলাদেশের নারীরা এই প্রথম ঘর থেকে বেরিয়ে এসে মিছিল ও পিকেটিং-এ অংশ নিয়েছিলেন। এই সময় সর্বপ্রথম শ্রমিক শ্রেণীর অর্থনৈতিক ক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে তাকে রাজনৈতিক সংগ্রামে রূপান্তরিত করার চেষ্টা চালানো হয়েছিল। বেশ কিছু স্বদেশি নেতা তৎকালীন জার্মানি ও রাশিয়ার আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রবাদী মতাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। স্বদেশি পণ্যের ব্যবহার ও বিদেশি পণ্য বয়কট ছিল স্বদেশি আন্দোলনের সবচেয়ে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। একে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল স্বদেশি উদ্যোগে শিল্প প্রতিষ্ঠান, স্বদেশি ব্যাংক, স্বদেশি বীমা এবং ইংরেজ নিয়ন্ত্রণ ও ইউরোপীয় প্রভাব মুক্ত জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। আন্দোলনের এই ব্যাপকতা সত্ত্বেও এই আন্দোলন সফল হয়নি। ১৯০৮ সাল নাগাদ স্বদেশি আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি স্তব্ধ হয়ে যায়। স্বদেশি আন্দোলনের ব্যর্থতার জন্য অনেকেই রাষ্ট্রীয় দমননীতিকে দায়ী করেছেন।

একথা অস্বীকার করা যায় না, রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন স্বদেশি আন্দোলনের ইতি টানতে অনেকটাই সাহায্য করেছিল। কিন্তু কেবলমাত্র সরকারি দমনপীড়ন দিয়েই এই আন্দোলনের ব্যর্থতা ব্যাখ্যা করা যাবে না।

মার্কসবাদী লেখক রজনী পাম দত্ত তাঁর *India Today* গ্রন্থে বলেছেন—স্বদেশি আন্দোলনে 'শহুরে পেটি বুর্জোয়া শ্রেণীর হতাশা প্রতিফলিত হয়েছিল' (...reflected the discontent of the urban petty bourgeoisie.)। রজনী পাম দত্তের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে রেইসনার অথবা কোমারভ প্রমুখ সোভিয়েত ঐতিহাসিক এই আন্দোলনের 'পেটি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক' (Petty bourgeois democratic) চরিত্র খুঁজে পেয়েছেন। কিন্তু এই বক্তব্য সম্পূর্ণ খারিজ করে দিয়েছেন অমলেশ ত্রিপাঠী ও সুমিত সরকার। সুমিত সরকার তথ্য সহাকারে দেখিয়েছেন যে, বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর মানুষ জমিদার, গ্রামীণ নিম্নবিত্ত, কারিগর, শ্রমিক সকলেই এই আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। তাই এক কথায় এই আন্দোলনকে সরলীকৃত মার্কসীয় শ্রেণী বিশ্লেষণের ছাঁচে ফেলে 'শহুরে পেটি বুর্জোয়া' নিয়ন্ত্রিত আন্দোলন হিসাবে আখ্যায়িত করা চলে না। তা সত্ত্বেও সুমিত সরকার নিজেই স্বীকার করেছেন শ্রমিক শ্রেণীকে সংগঠিত করার প্রয়াস সত্ত্বেও অথবা বরিশালের সাধারণ গ্রামবাসীর মধ্যে অশ্বিনীকুমার দত্তের প্রশ্নাতীত জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও, একথা অস্বীকার করা যায় না যে, স্বদেশি আন্দোলন ছিল মূলত ভদ্রলোকদের ব্যাপার। তবে 'ভদ্রলোক' শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। ময়মনসিংহের মহারাজা থেকে ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ের কেরানি সকলেই 'ভদ্রলোক' অভিধায় ভূষিত হতেন। তবে এই আন্দোলনকে মূলত ভদ্রলোকদের আন্দোলন বললে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ের বাইরে এই আন্দোলন বেশি দূর এগোতে পারেনি।

একথা সত্যি যে স্বদেশি আন্দোলনে জমিদার শ্রেণীর অংশগ্রহণ ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কাশিমবাজারের মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, নাটোরের যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, ভাগ্যকুলের সীতানাথ রায়, মুক্তাগাছার সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী, উত্তরপাড়ার পিয়ারীমোহন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ জমিদার স্বদেশি আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। এঁরা অনেকেই স্বদেশি তহবিলে মোটা টাকা চাঁদা দিয়েছিলেন। কিন্তু সবক্ষেত্রেই এঁদের ভূমিকা ভালো ছিল না। আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে বহু জমিদারই আদর্শচ্যুত হয়ে ব্রিটিশরাজের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন। দিনাজপুরের গিরিজানাথ রায় এবং দ্বারভাঙ্গার মহারাজা রাজভক্তিতে অটল ছিলেন। বর্ধমানের মহারাজা সরকারকে তোষামোদ করার জন্য বর্ধমান শহরে 'কার্জন গেট' তৈরি করেন। ১০৭ জন জমিদার স্বদেশি আন্দোলনজনিত বিশৃঙ্খলা দমনের জন্য সরকারকে যাবতীয় সাহায্য করার লিখিত প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এই স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে একদা স্বদেশি আন্দোলনের সমর্থক সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী এবং সীতানাথ রায়ও ছিলেন। বড়ো জমিদারদের এই দ্বৈধতা স্বদেশি আন্দোলনের ভিত্তি দুর্বল করেছিল।

স্বদেশি আন্দোলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দুর্বলতা ছিল—আন্দোলনের নেতৃত্ব কৃষকদের স্বার্থসংক্রান্ত কোনো কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারেননি। ১৯০৭ সালের *বেঙ্গলি* পত্রিকায় বাংলায় রায়তদের ক্ষোভ সংক্রান্ত একটি দীর্ঘ চিঠি প্রকাশিত হয়। এই চিঠিতে কৃষকদের ওপর যথেচ্ছ হারে খাজনা চাপানো, আবওয়াব ধার্য করা, কৃষকদের ওপর মহাজনদের অত্যাচার প্রভৃতি বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছিল। কিন্তু বিষয়গুলি নেতৃত্বের মধ্যে বিশেষ প্রভাব ফেলেনি। কৃষকদের ক্ষোভ ও দাবি-দাওয়া নিয়ে তাদের সংগঠিত করার প্রয়াস নেওয়া হয়নি। কৃষকরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বয়কট বা 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ'-এর মতো সংগ্রামী কৌশলে যোগ দেননি। যে দেশের বিরাট সংখ্যক মানুষ কৃষিজীবী, সে দেশের কোনো জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে কৃষকদের যোগদান একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আন্দোলনের রঙ্গমঞ্চে কৃষকদের অনুপস্থিতি আন্দোলনকে শক্তিহীন করেছিল।

স্বদেশি আন্দোলনের প্রধান দুর্বলতা ছিল এই আন্দোলন মুসলমান ধর্মাবলম্বী মানুষের সমর্থন আদায় করতে পারেনি। আন্দোলনের সূচনায় বেশ কিছু জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতা স্বদেশি আন্দোলনে অংশ নিয়েছিল। এঁদের মধ্যে আবদুল হালিম গজনভি, লিয়াকত হোসেন, আব্দুল রসুল, দেদার বক্স, মনিরুজ্জমান প্রমুখ ছিলেন উল্লেখযোগ্য। বয়কট পরিকল্পনার অন্যতম পথিকৃৎ ছিলেন লিয়াকত হোসেন, ইস্ট ইন্ডিয়া রেল শ্রমিক ধর্মঘটের একজন প্রধান উদ্যোক্তাও ছিলেন তিনি। আবদুল রসুল ছিলেন বরিশাল জেলার এক শ্রদ্ধেয় গণনেতা এবং অশ্বিনীকুমার দত্তের ঘনিষ্ঠ সহযোগী। আবদুল হালিম গজনাভি ব্রিটেনে তৈরি চামড়ার পণ্য বয়কটের আন্দোলনকে সংগঠিত করেছিলেন। স্বদেশি শিল্পোদ্যোগে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন তিনি। তা সত্ত্বেও কিছুদিনের মধ্যেই মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ স্বদেশি আন্দোলনের মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। এর পেছনে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল। স্বদেশি নেতারা জনসাধারণকে সংঘবদ্ধ করার যেসব পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন, তার ফল সবসময় ভাল হয়নি। চিরাচরিত জনপ্রিয় রীতিনীতি, উৎসব ও অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছিল। এই উৎসব অনুষ্ঠানগুলি ক্রমে হিন্দু উৎসব অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল। বাঙালি জাতীয়তাবাদ হিন্দু জাতীয়তাবাদের সমার্থক হয়ে উঠেছিল। বহু স্বদেশি নেতাই তাঁদের বক্তৃতায় প্রকাশ্যে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলতেন। *বন্দেমাতরম্*, *সন্ধ্যা* ও *যুগান্তর*-এর মতো পত্রিকাগুলিতে ব্রিটিশ বিরোধী র‍্যাডিক্যাল রাজনীতির সঙ্গে উগ্র হিন্দুত্বের প্রচার মিশে যেত। এই ধরনের ঘটনা স্বাভাবিকভাবেই মুসলমান জনতাকে হতাশ করেছিল। তবে এর ব্যতিক্রমও ছিল। অশ্বিনীকুমার দত্ত বরিশালের মুসলমান গ্রামবাসীদের সংগঠিত করার চেষ্টা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন লেখায় ও বক্তব্যে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের কথা ধ্বনিত হয়েছিল। *সঞ্জীবনী* ও *প্রবাসী* পত্রিকা স্বদেশি আন্দোলনে উগ্র হিন্দুত্বের প্রভাবকে ভাল চোখে দেখেনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও হিন্দুত্বের প্রকাশ ও প্রচার বাংলার

মানুষকে বিভক্ত করেছিল। পরিস্থিতির সুযোগ নিতে তৎপর হয়ে উঠেছিল ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী। 'বিভেদ ও শাসন' নীতি প্রয়োগ করে তারা সাম্প্রদায়িক বিভাজনকে আরও তীক্ষ্ণ করে তুলেছিল। ইংরেজ সরকার মুসলমান রাজন্যবর্গ, জমিদার ও তালুকদারদের স্বদেশি আন্দোলনকে দুর্বল করার জন্য প্রত্যক্ষ মদত দিয়েছিল। এই সম্পদশালী মুসলমানদের প্রতিষ্ঠান 'মুসলিম লিগ' (১৯০৬) তার জন্মলগ্ন থেকেই স্বদেশি আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিল। ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ্‌র মদতপুষ্ট মোল্লা ও মৌলবিরা নদিয়া, ঈশ্বরগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবেড়িয়ার পরিস্থিতি উত্তেজক করে তুলেছিল। ১৯০৬ সাল থেকেই বাংলার বিভিন্ন স্থানে বিশেষ কুমিল্লা, বাখরগঞ্জ, জামালপুর ও ময়মনসিংহতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখা দিয়েছিল।

এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পেছনে বাংলার মানুষের শ্রেণীগত অবস্থান কাজ করেছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হিন্দুরা ছিলেন ভূস্বামী জমিদার এবং মুসলমানেরা কৃষক। কৃষকেরা যখন জমিদারদের বিরুদ্ধে তাদের নায্য দাবি-দাওয়ার আন্দোলন গড়ে তুলেছিল, তখন সরকারের তরফ থেকে এই আন্দোলনগুলিকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল। অমলেশ ত্রিপাঠী সঠিকভাবেই মন্তব্য করেছেন—হিন্দু জমিদার, কর্মচারী, মহাজন কর্তৃক নিপীড়িত মুসলিম প্রজা ও ভাগচাষীদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক উস্কানি দেওয়া সহজ ছিল। খাজনা বানিয়ে, মাথোট বসিয়ে, প্রতিমা পূজা বাবদ ঈশ্বরবৃত্তি চাপিয়ে এই জমিদারের দল স্বদেশি আন্দোলনের বিরোধিতাই করেছিল। ১৯০৭ সালের মে মাসে ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের একটি রিপোর্টে বলা হয়েছিল—বাজার এলাকার দরিদ্র মুসলমানেরা কুমিল্লা শহরের দাঙ্গায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল আর ময়মনসিংহতে কৃষকদের ক্ষোভ দাঙ্গায় প্রতিফলিত হয়েছিল। এদের আক্রমণের লক্ষ ছিলেন হিন্দু জমিদার ও মহাজনরা যাঁরা প্রতিমা পূজার জন্য মুসলমান প্রজাদের ওপর ঈশ্বরবৃত্তি চাপিয়েছিলেন। ঋণপত্রগুলি ছিঁড়ে ফেলেছিলেন দরিদ্র মুসলমান চাষীরা এবং বহুক্ষেত্রে তাঁরা হিন্দু কৃষকদেরও সমর্থন পেয়েছিলেন। সরকারি প্রতিবেদনে (জুলাই, ১৯০৭) বলা হয়েছিল—দরিদ্র মানুষের দ্বারা ধনীদের লুণ্ঠন এই দাঙ্গাগুলির লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে মুসলমান মৌলবিরা গুজব ছড়ান যে, ইংরেজ সরকার শীঘ্রই পূর্ববঙ্গের দায়িত্ব ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ্‌র হাতে অর্পণ করবে। মৌলবিদের তরফ থেকে 'নবাব সাহেবের সুবিচার' নামে একটি প্রচার পুস্তিকা বিলি করা হয়েছিল। সেখানে বলা হয়েছিল—নবাব সলিমুল্লাহ্ অচিরেই পূর্ব বাংলার দরিদ্র মুসলমানদের ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বন্ধ করার জন্য স্বদেশি নেতা লিয়াকত হোসেন মুসলমানদের মধ্যে একটি প্রচার পত্র বিলি করেছিলেন। দরিদ্র মুসলমান প্রজাদের ওপর এই প্রচারপত্র বেশ কিছুটা প্রভাব ফেলেছিল। এই প্রচার সাফল্যে আশঙ্কিত হয়ে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়াবার কাজে ইব্রাহিম খাঁকে লাগিয়েছিলেন।

স্বদেশি আন্দোলনের যুগে এই সাম্প্রদায়িক বিভাজনের জন্য কেবল ইংরেজ শাসকদের দায়ী করলেই হবে না। ১৯০৭-০৮ সালে লেখা একাধিক প্রবন্ধে এবং পাবনা প্রাদেশিক কনফারেন্সে (ফেব্রুয়ারি, ১৯০৮) সভাপতির ভাষণে রবীন্দ্রনাথ বারংবার একথা বলেছিলেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর বিখ্যাত উক্তি—'শনি তো ছিদ্র না পাইলে প্রবেশ করিতে পারে না ; অতএব শনির চেয়ে ছিদ্র সম্বন্ধেই সচেতন হইতে হইবে।' স্বদেশি নেতারা এই ছিদ্রের সমস্যা সমাধান না করে বয়কট জোর করে চাপাতে চেয়েছিলেন। ফলে কোনো কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া ছিল অনিবার্য। এদেশের মিলে তৈরি কাপড় চালু করার জন্য দরিদ্রের নাগাল থেকে সস্তা বিলাতি বস্ত্র সরিয়ে নেওয়ার ফলে তাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। কারণ দেশি কাপড় ছিল দরিদ্র মানুষের ক্রয় ক্ষমতার সীমার বাইরে। বলপূর্বক বয়কট চাপাতে গিয়ে হিন্দু স্বদেশি নেতারা স্বাভাবিকভাবেই মুসলমানদের বিরাগভাজন হয়েছিলেন কারণ মুসলমানেরা ছিলেন অপেক্ষাকৃত দরিদ্র। এই অনৈক্য ও বিভেদের সুযোগ নিয়ে ইংরেজ সরকার স্বদেশি আন্দোলনকে দুর্বল করতে চেয়েছিল। বলপূর্বক বিদেশি পণ্য বয়কটসংক্রান্ত পদক্ষেপ দরিদ্র মুসলমানদের স্বার্থ কীভাবে বিঘ্নিত করেছিল তার বিবরণ পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের *ঘরে বাইরে* উপন্যাসে। বহু মুসলমানই বাজার এলাকায় বিলাতি পণ্য বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

আন্দোলনকারীদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব স্বদেশি আন্দোলনে অনৈক্য এনেছিল। নরমপন্থী-চরমপন্থী বিরোধ স্বদেশি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে তীব্র রূপ নিয়েছিল। সুরেন্দ্রনাথ, গোপাল কৃষ্ণ গোখেল প্রমুখ নেতারা প্রথম থেকে বয়কটের বিরোধী ছিলেন। পরে তাঁরা বয়কট মেনে নিলেও তাঁরা বয়কটের সীমিত প্রয়োগের পক্ষপাতী ছিলেন। অন্যদিকে অরবিন্দ ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল, তিলক প্রমুখ চরমপন্থী নেতাদের কাছে বয়কট ছিল স্বরাজ লাভের হাতিয়ার। তাছাড়া পরিসংখ্যানগত তথ্যের ভিত্তিতে আমরা আগেই দেখছি যে বয়কট বিদেশি পণ্যের আমদানি হ্রাসের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য পায়নি। অন্যান্য প্রদেশের ব্যবসায়ীরা দেশি পণ্য বিক্রির ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ দেখায়নি। তার ওপর নরমপন্থী-চরমপন্থী বিরোধ আন্দোলনের ভিত্তিকে দুর্বল করেছিল। ১৯০৬ সালে কলকাতা কংগ্রেসে উভয়পক্ষে তুমুল বিতর্ক হয়েছিল। শেষপর্যন্ত এই বিরোধকে কেন্দ্র করে সুরাট কংগ্রেসে (১৯০৭) কংগ্রেস ভেঙে যায়। কংগ্রেসের ভাঙন ছিল স্বদেশি আন্দোলনের ওপর এক অপ্রত্যাশিত আঘাত।

স্বদেশি আন্দোলন বাংলার বাইরে ছড়িয়ে পড়লেও দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মানুষ এই অভিনব পদ্ধতির আন্দোলনের রাজনীতি আয়ত্ত করার পক্ষে পুরোপুরি প্রস্তুত ছিল না। তার ওপর ১৯০৭ সাল থেকেই নেতৃত্বের সংকট প্রকট হয়ে ওঠে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের জাতীয়তাবাদী নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। ১৯০৭-০৮ সালের

মধ্যেই অশ্বিনীকুমার দত্ত ও কৃষ্ণকুমার মিত্র সহ বাংলার ৯ জন গুরুত্বপূর্ণ নেতাকে দ্বীপান্তরে পাঠানো হয়। বিপিনচন্দ্র পাল ও অরবিন্দ ঘোষ সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে যান। এক আঘাতেই আন্দোলনকে নেতৃত্বহীন করে দেওয়া হয়েছিল।

স্বদেশি আন্দোলনের পেছনে কোনো কার্যকর সংগঠন ছিল না। কর্মসূচির দিক থেকে 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ', অসহযোগিতা, অহিংসা, সামাজিক সংস্কার, গঠনমূলক কাজ প্রভৃতি বিভিন্ন কৌশল আন্দোলনকারীরা প্রয়োগ করেছিলেন। কিন্তু একটি বিশেষ কেন্দ্র থেকে পরিচালিত হয়ে উপরোক্ত কৌশলগুলি একটি সুশৃঙ্খল ও সুবিন্যস্ত রূপ নিতে ব্যর্থ হয়েছিল। বিভিন্ন মত ও বিভিন্ন ধারার অনুপ্রবেশ স্বদেশি আন্দোলনকে দুর্বল করেছিল। উপরোক্ত রাজনৈতিক কৌশলগুলিকে ব্যবহারিক রাজনৈতিক অভ্যাসে পরিণত করা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া গণ-আন্দোলনের নিজস্ব যুক্তিধারা অনুযায়ী এই আন্দোলন একটা সময়ের পর স্তিমিত হয়ে পড়ে। একটি জঙ্গি আন্দোলন একই গতিতে বেশিদিন গতিশীল থাকতে পারে না বা আত্মত্যাগ চিরকাল করা যায় না। যে মুহূর্তে সরকারি দমনপীড়ন মারাত্মক হয়ে উঠেছিল, সে মুহূর্তে আন্দোলনের গতি স্তব্ধ হয়ে পড়েছিল। যে উচ্ছ্বাস ও উদ্দীপনার মধ্যে স্বদেশি আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল, ১৯০৮ সালের মধ্যেই তা শেষ হয়ে যায়।